

শিক্ষাকে বলি দিয়ে শিক্ষার বিস্তার?

যুক্তি তর্ক গল্প

আবুল মোমেন

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থাকছে—শিক্ষামন্ত্রীর কথায় অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে। শিক্ষাবিদদের চাপাচাপিতে সরকার একবার এ'পরীক্ষাটি বন্ধ করার কথা বলেও আবার মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে তা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বছরের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা চলছে। এরপর নিশ্চয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারকে শিক্ষায় ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র, মহানগর-মফস্বল-গ্রাম-চরাঞ্চল-পার্বত্য এলাকাবাসী ইত্যাদি সব পর্যায়ের নাগরিকের অন্তর্ভুক্তির বিষয় মাথায় রাখতে হয়। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একবার আমাকে বলেছিলেন, পরীক্ষাকে সরকার একটি উৎসবে রূপ দিতে পেরেছে এবং দেখা যায় গ্রামাঞ্চল-চরাঞ্চলের শিশুরাও অভিভাবকদের সঙ্গে হেঁটে, ভ্যান বা রিকশায় দল বেঁধে সেজেগুজে পরীক্ষার হলে যায়। এই উৎসবের আমেজ তাদের উৎসাহ বাড়ায়, ভয় দূর করে এবং সব মিলে শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হয়। তা ছাড়া এখনো অনেক ছেলেমেয়ে, বিশেষত মেয়েশিশু, প্রাথমিকেই ঝরে যায়। পরীক্ষা এবং সনদ তাদের অন্তত এটুকু পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমে ধরে রাখতে সহায়ক হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায় যে সত্যতা নেই তা নয়। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে তারা একটি পাবলিক পরীক্ষা দিচ্ছে এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবার চেষ্টায় তাতে উৎসবমুখর পরিবেশও সৃষ্টি করা গেছে। তাহলে অসুবিধাটা কোথায়?

শিক্ষায় সনদ একটি নগদপ্রাপ্তি, এর কিছু মূল্য হয়তো জীবনে কখনো মিলতেও পারে—যদিও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি কেবল প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পাসের সনদ দিয়ে জোটে না। তার জন্য নিদেনপক্ষে জেএসসি সনদ লাগবে। দিনে দিনে সেটারও মূল্য থাকবে না। বাস্তবতা হলো, এখন ডিগ্রি পাস করেও অনেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরি করছেন। চাকরির বাজার সম্প্রসারিত হলেও বাস্তবতা এ রকমই থাকবে।

শিক্ষার মূল কাজ তো সনদ অর্জন নয়, প্রাথমিক বা নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে তা তো নয়ই। এমনতেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বড় দুর্বলতা হলো এর পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা। পরীক্ষাকে ঘিরেই পড়াশোনার আয়োজন চলতে থাকায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই মিলে পরীক্ষা-উপযোগী বা পরীক্ষাবান্ধব একটা ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে। পিএসসি ও জেএসসি এই প্রবণতাকে জোরদার করেছে।

পরীক্ষার ভিত্তিতে পড়াশোনা চলতে থাকলে তার ফলাফল কী হয় সেটা আমরা বাস্তবেই হাতে হাতে পাচ্ছি। আমি দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ভর্তি পরীক্ষার ভয়াবহ ফলের ওপর জোর দেব না। এটি একটি চরম বাণিজ্যিক এবং অমানবিক ব্যবস্থা, এটি ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রের মেধা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের কার্যকর মাধ্যম নয়। এতে গোড়া থেকেই বাদ দেওয়ার কৌশল গুরুত্ব পায়, অবজেকটিভ প্রশ্নের এক ঘণ্টার পরীক্ষায় উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি বোঝাও মুশকিল।

তবে মাঠপর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিকের অর্জন মান যাচাইয়ের যে কাজ ক্যাম্পে ও সরকারের উদ্যোগে হয়েছে তার ওপর নির্ভর করা যায়। এতে দেখা গেছে অর্জন-মান সন্তোষজনক, ছাত্রদের বড় অংশ—শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ—মাতৃভাষা ও গণিতে দুর্বল,



ইংরেজিতে তো বাটেই। আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখছি সরকারি প্রাথমিকে অর্জন মানের অবস্থা শোচনীয়—ভাষা, গণিত ও সাধারণ জ্ঞানে বয়সের তুলনায় মান অনেক কম।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো। ইদানীং দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোক্তারা বিশেষজ্ঞ ছাড়াও ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক হিসাবরক্ষকের মতো মাঝারি স্তরে বিদেশিদের নিয়োগের দিকে ঝুঁকছেন। ভারত, শ্রীলঙ্কা, এমনকি পাকিস্তান থেকেও অনেকেই এ ধরনের চাকরিতে আসছেন। অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের হার বাড়ছে।

শিক্ষার মান আসলেই যে কমেছে তা বোঝা যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের অবনতিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষার মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিশ্বে এর অবস্থান ৫০০-এর মধ্যেও নেই। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা—সম্ভবত একমাত্র বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ব্যতীত—আরও তলানিতে রয়েছে। গবেষণার সংখ্যা ও মান, গবেষণা পত্রিকার স্বীকৃতি ধরলেও আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া যায় না।

এসব তথ্য ও বক্তব্যের অর্থ অবশ্য এই নয় যে আমাদের ছাত্রদের মেধা ও মান খারাপ। তা যে নয় তার প্রমাণ আমাদের তরুণেরা দেশে ও বিদেশে অহরহ দিচ্ছে। কিন্তু দেশের প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ক্রমেই সেই সুযোগ কমে আসছে।

মূলধারার উচ্চশিক্ষা যেভাবে চলছে, তাতে ছাত্রদের বড় অংশ নিজের পছন্দের বিষয় পড়ার সুযোগ পায় না। ফলে তারা গোড়া থেকেই

অনিচ্ছুক ও উদাসীন ছাত্র। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কোনোভাবে এমএ পাস করে সর্বোচ্চ ডিগ্রির সনদ অর্জন। তাদের লেখাপড়া সীমাবদ্ধ থাকে আসন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য পাঁচ-ছয়টি প্রশ্ন জানা ও সেগুলোর উত্তর মুখস্থ করার মধ্যে। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে উচ্চশিক্ষার যে উদ্দেশ্য—পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা, বিশ্লেষণ করতে শেখা এবং নতুন ধারণা ও ভাবনা উপস্থাপন—তার কোনো অবকাশ এখানে থাকে না। পরীক্ষার বাইরে ছাত্রের তেমন কিছু করার নেই, জ্ঞান বা মনন চর্চার বিভিন্ন উপায়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে না। ফলে আড্ডা, নেশা, অপরাধীনতা, মেয়েদের পেছনে লাগা ইত্যাদি বিচিত্র ক্ষতিকর কাজে তাদের তারুণ্য ব্যয়ে যায়। এটি জাতীয় অপচয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, যা তিনি নিজের শিক্ষা সম্পর্কে বলেছিলেন—আমাদের শিক্ষার প্রায় সবটাই লোকসানি মাল। সরকার এবং বিশ্বব্যাংক, এডিভিসহ বিদেশি অনেক সংস্থা শিক্ষা খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে বেশ অনেক বছর ধরে। তাতে স্কুলের ঘরবাড়ির উন্নতি হয়েছে, বিনা মূল্যে উন্নত মুদ্রণের ভালো বই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও স্কুলের পোশাক দেওয়া হচ্ছে, সীমিত আকারে দুপুরের খাবার চালু হয়েছে, বাথরুম-পানি সরবরাহের উন্নতি হচ্ছে, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত আগের চেয়ে ভালো, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও বেড়েছে। কিন্তু এসব উন্নয়নের ফলাফল শিক্ষায় দৃশ্যমান হচ্ছে না। আমি বলব, নিচের পর্যায় থেকেই শিক্ষাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে রাখার ফলেই এই বিপুল আয়োজন, শ্রম ও ব্যয়ের

যথার্থ সফল আমরা পাচ্ছি না।

পরীক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যে ব্যবস্থা, তা চালু রেখে শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রবণতা, কোচিং সেন্টারের দৌরাঘা এবং নোটবইয়ের রমরমা ব্যবসা বন্ধ করা যাবে না। কারণ, ছাত্রদের অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন না, হয়তো বাস্তব কারণ আছে তার। প্রথমত, আমাদের প্রাথমিকের ছাত্রদের বড় অংশই শিক্ষাবঞ্চিত বা স্বল্পশিক্ষিত বাবা-মায়ের সন্তান, যারা সন্তানের শিক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারেন না। তদুপরি শিক্ষিত-শিক্ষাবঞ্চিত সব বাবা-মা বাড়তি উপার্জনের চাপে থাকেন; নয়তো কর্মকর্তা হয়ে ফিরে আর, সন্তানকে সময় দিতে চান না। গৃহশিক্ষক বা কোচ নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের একমাত্র উপায় হিসেবে পান পরীক্ষার ফলাফলকে, যা তাঁর যোগ্যতা-দক্ষতার জলজ্বলে প্রমাণ হাজির করতে পারেন। এ প্রক্রিয়া একদম প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু হয়ে উচ্চতর স্তরেও চলতে থাকে।

এটি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এভাবে ছাত্রদের মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা, সব রকম সৃজনশীলতা নষ্ট তো হয়ই, উপরন্তু তাদের আত্মবিশ্বাস, যোগ্যতা-দক্ষতারও ঘাটতি থেকে যায়।

কিন্তু ঘাটতি থাকে তা বোঝাও কঠিন নয়। পরীক্ষার পড়া হয় প্রশ্নের ভিত্তিতে—সম্পূর্ণ একটি গল্প, অধ্যায় বা ধারণার সঙ্গে পরিচয় এতে গুরুত্ব পায় না, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ওই পরীক্ষাটিতে নির্দিষ্ট গল্প বা অধ্যায় থেকে কোন প্রশ্নটি আসতে পারে সেটি। দক্ষ শিক্ষকেরা বিভিন্ন বছরের প্রশ্ন ঘেঁটে সেটি বের করেন এবং সেই প্রশ্নের তাঁদের তৈরি উত্তরটি ছাত্রকে শেখান। পরীক্ষার ভালো ফলই যেহেতু মোক্ষ, তাই এ ধরনের 'সফল' শিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের ওপর অভিভাবকদের আস্থা বাড়ছে এবং তা এখন স্কুলের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকেরাও এতে আর্থিকভাবে লাভবান হন, ফলে তাঁরাও তা-ই চান। শিক্ষা বলতে ক্রমে পরীক্ষাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে—কোচিং সেন্টারগুলো এবং তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'সফল' স্কুলগুলোও অনবরত বছরজুড়ে মডেল টেস্ট নিতে থাকে। এভাবে ছাত্রেরা পরীক্ষা দিতে দক্ষ হয়ে ওঠে। যত অল্প আনুগত্যে ছাত্রেরা এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে, ততই তারা নিজের, বাবা-মায়ের, স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। যদিও—আবারও রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—শিক্ষার হৃদমুদ সারা হয় তত দিনে।

পরীক্ষাকে যতই উৎসবের রূপ দেওয়া হোক না কেন, নিরন্তর পরীক্ষার ডিলের ভেতর দিয়ে জীবনের প্রস্তুতিপর্ব পার করে একজন তরুণ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে—সে শৈশব থেকেই একজন পরীক্ষার্থী, শিক্ষার্থী নয়। বরং যখন তার শিক্ষাজীবন শেষ হয় তখন দেখা যায় তার জ্ঞানভাণ্ডারে তেমন সঞ্চয় জমেনি। কারণ, চাপের মধ্যে সে মুখস্থ বা বারবার অভ্যাস করে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, তার সঙ্গে আত্মবিকাশ-আত্মপ্রকাশের তেমন সম্পর্ক না হওয়ায় পরীক্ষার পর শেখা বিষয়গুলো তাদের কিছুই মনে থাকে না। আজকাল দেখা যায়, প্রথম শ্রেণির পড়া দ্বিতীয় শ্রেণিতে আসতে আসতে অনেকটাই ভুলে যায় শিশুরা। আমাদের শিক্ষা তার ব্যবস্থার গুণে ছাত্রের পড়ার আগ্রহ অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেয়।

এভাবে সরকারের যোগ্যতা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মেধাভিত্তিক সমাজ তৈরি করা সম্ভব হবে না। এভাবে বিপুল অর্থ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শৈশব থেকে তারুণ্য এবং প্রতিভা ও মেধার অপচয় হতে দেওয়া কি ঠিক? শিক্ষার বিস্তার চলছে ঠিকই, তবে তার মূল্য পরিশোধ করছি শিক্ষাকেই বলি দিয়ে।

● আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।